ভূমিকা

বিশ শতক বিশ্বের দরবারে একে একে যে সব চিন্তার জগত নিয়ে হাজির হয়েছিল তাতে বদলে গিয়েছিল ভাবনাচিন্তার পরিধি বা এতদিন ধরে আঁকড়ে থাকা ভাবনা। বলতে থাকা কথা, লিখতে থাকা ভাষা, বুঝতে থাকা শব্দ বা গড়তে থাকা বিশ্বাসই কী সব, নাকি সেই সত্য ভেঙে ভেঙে, বদলে বদলে তৈরী হতে পারে নতুন সত্য, কিংবা সেগুলোও আসলে সত্য নয় তার ভেতরেও আছে নতুন তল বা অন্য এক নতুন সত্য। আসলে এই আধুনিক সময় বদলে দিয়েছে মননশীল সমাজের প্রেক্ষণবিন্দু। শিল্প, সাহিত্য, জীবন, মনন, ভাষা, কথা, শব্দ ইত্যাদি যা কিছু পার্থিব তার সবেরই বেরিয়ে পড়েছে নতুন তল (dimension)। বহুকালের জীবন চর্যা নিজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নতুন মাত্রা নিয়ে। সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে তুলে এনেছে এক নতুন মাত্রা, এক নতুন অভিমুখ। সব কিছুকে দেখতে শিখেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, বুঝতে শিখেছে নতুন মনন নিয়ে, ভেসে উঠেছে নতুন মুখ, চিনে নিয়েছে নতুন দেহ। তাই এই সময় প্রকট করেছে অস্তিত্বের সংকটকে। সমাজ, জীবন তথা সাহিত্য এগিয়েছে এক নতুন পথে।

মানব সভ্যতা বিবর্তনের পথে প্রতিনিয়ত পৌঁছে যাচ্ছে নিত্য নতুন শিখরে, আবিষ্কার হচ্ছে নিত্য নতুন ভোগ্যপণ্য, অন্য কোথাও, অন্য কোনও খানে পৌঁছে যেতে চাইছে জীবন। আসলে এগিয়ে চলার এই পথে আমরা পেছনে ফেলে আসি না আমাদের অতীতকে, অতীতকে নিয়েই আমরা এগিয়ে চলি ভবিষ্যতের পথে। অতীতেই নিহিত থাকে সভ্যতার শিকড়। ভবিষ্যৎ মুহূর্তেই অতীত তাই অতীতেই শুরু হয় আত্ম অনুসন্ধান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাস ত্রয়ীতে এই শিকড়ের টানেই চালিয়েছেন ইতিহাস সন্ধান। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন

রাজনৈতিক ইতিহাসকে সামনে রেখে, এই তিনটে উপন্যাসের সময় সন্ধানের পথে তিনি খুঁজেছেন বাঙালী সমাজ তথা সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, জীবনের দর্পণ। সমাজ এগিয়ে চলে যে প্রবাহে, সাহিত্যও এগিয়ে চলে সেই একই প্রবাহে, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। এদেশে মধ্যযুগীয় পরিমন্ডলে আধ্যাত্মিকতা নির্ভর দেববাদ ছিল সাহিত্যের প্রধান সুর, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ইউরোপে চার শতাব্দী ধরে ঘটে চলা নবজাগরণের ঢেউ এসে লাগতে থাকল ভারতীয় উপমহাদেশের কূলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান চেতনা এদেশের মানুষকে পরিচিত করালো ইউরোপীয় যন্ত্র নির্ভর আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে। প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদের গায়ে আছড়ে পড়ল পাশ্চাত্য জড়বাদের ঢেউ। আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে ঐহিকতার প্রতি সচেতন হতে শুরু করল ভারতবাসী। সমাজ থেকে বড় হয়ে উঠল ব্যক্তি, দেবতার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা পেল মানুষ। বাস্তবতার প্রতি আকর্ষণে মানুষ হারিয়ে ফেলতে শুরু করল বহুকালের ঐতিহ্য, সংস্কার, বিশ্বাসের প্রতি আস্থা। বিদেশি সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারে সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই কাব্যের দীর্ঘ প্রবাহের ধারা পেরিয়ে বাংলা গদ্য ভাষার জয়যাত্রা শুরু হল। বাস্তব জীবনকে নিয়ে শুরু হল নিরন্তর নিরীক্ষার পর্ব।

বাংলা সাহিত্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এগোলো বাস্তবতা ভিত্তিক গদ্য সাহিত্যের দিকে, উপন্যাস রচনার দিকে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কলিকাতা কমলালয়’, ‘নববাবু বিলাস’, ‘নববিবি বিলাস’; হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’; প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’, কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হতোম প্যাঁচার নকসা’ প্রভৃতি রচনার পথ পেরিয়ে ১৮৬৫ তে প্রথম সার্থক উপন্যাস এল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দুর্গেশ নন্দিনী’ র হাত ধরে।

উপন্যাস রচনার প্রথম যুগ থেকেই উপন্যাস এগোলো ব্যক্তি হৃদয় ও ব্যক্তি চরিত্রের সার্বিক রূপায়ণের পথে। উপন্যাসের বিশাল ব্যাপ্তি হয়ে উঠল জীবন নিরীক্ষার একটা বৃহত্তম ভূমি। জীবন নিরীক্ষার এই প্রবাহ বয়ে চলল দুটো ধারায় একদিকে উপন্যাসে উঠে আসতে শুরু করল ইতিহাসের ঘটনা, অন্যদিকে রচিত হতে থাকল সমসাময়িক সময় নির্ভর সামাজিক ও পারিবারিক বৃত্ত। তবে উপন্যাসের মূল উপাদান বাস্তবতা এই দুই বৃত্তেরই প্রধান ও প্রবল সুর।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় মানুষের জীবনচর্যা, জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টি। সাহিত্যেরও দিক পরিবর্তন ঘটে জীবনের এই পরিবর্তনের পথেই। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে জীবন-নিরীক্ষার যে ধারা উঠে এল, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা নতুন দিগন্ত লাভ করল। বঙ্কিম উপন্যাসের ভূমিতে একদিকে নিয়ে এলেন ইতিহাসকে, অন্যদিকে তিনি আনলেন সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বৃত্তকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমের অনুসরণে ইতিহাসকেই আশ্রয় করলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি হাঁটলেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথে। ১৯০৩ সালে 'চোখের বালি' তে তিনি তুলে আনলেন 'আঁতের কথা'। কিন্তু বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রযুগ পেরিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল আরও জটিল আবর্তের মধ্যে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল Sigmund Freud -এর 'The Interpretation of Dreams'-র ইংরেজি অনুবাদ, Freud -এর ভাবনা সারা বিশ্বের মানুষের আজন্ম লালিত চিন্তা-চেতনার মূলে আঘাত হানল। মানব মনের গভীর, জটিল, সর্পিল রহস্য সম্পর্কে সচেতন হল প্রগতিশীল সমাজ। ১৯২৩ থেকে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হল বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ক্লাসিক আখ্যা দিয়ে শুরু হল তাঁর আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল প্রয়াস। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল একটি নব্য লেখক গোষ্ঠী, সাহিত্যের মানদন্ড হিসাবে

বহুদিনের চর্চিত সত্য-শিব-সুন্দরের ধারণাকে তাঁরা ভেঙে চুরমার করে দিলেন। সাহিত্য আর সমাজের উঁচু তলার মানুষের কুক্ষিগত হয়ে রইল না, অন্ত্যজ প্রান্তিক মানুষেরা ঠাঁই পেতে শুরু করল সাহিত্যের আঙিনায়। কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা তাঁদের মূলধন হিসাবে গ্রহণ করলেন দারিদ্র্য ও যৌবন সম্ভোগের উল্লাসকে। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখরা সচেষ্ট হলেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

তিরিশের দশকের সাহিত্যিকেদের মধ্যে এল জীবন সম্পর্কে তির্যকদৃষ্টি; তাঁরা বুঝলেন রোমান্টিক যৌবন-স্বপ্ন নয়, আধুনিকতা আসে সংশয় ও অবিশ্বাসের পথে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশংকর; ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নিয়ে এলেন নতুন সুর। কিন্তু প্রবহমান সাহিত্যের ধারা কোথাও থেমে যায়নি। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে (১৯১৮-১৯৩৯) বাংলা সাহিত্যে যে পরিবর্তন চেতনার বিকাশ হয়েছিল চল্লিশের দশকের কথাকারদের মধ্যে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। চল্লিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে এল এক উত্তাল কালপর্ব। এই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিষবাষ্প মানুষকে পৌঁছে দিয়েছিল একটা অনিশ্চিতের ঘেরাটোপে। এ সময়ে সাহিত্যিকদের প্রতি সমাজের দাবি ছিল, সাহিত্যিক আজ শূন্যচারী স্বপ্ন বিহঙ্গ হয়ে থাকবেন না, মাটির পৃথিবীতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিক ব্রত গ্রহণ করবেন। গল্প লেখকেরা যুগের এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা জগৎ জীবন সম্পর্কে সচেতন না হয়ে পারেননি, রাজনীতি সচেতনতাও সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছিল আরও ব্যপক মাত্রায়। সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সতীনাথ ভাদুড়ী , আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখরা এই সময়ের

লেখক। এরপর ১৯৪৭-এর দেশভাগ বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিককে দিল এক প্রবল বাঁক। পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলার সাহিত্যিক সমাজ তথা সাহিত্য ভাগ হয়ে গেল রাজনৈতিক কাঁটাতারের বেড়ায়। দুই বাংলার সাহিত্যে উঠে আসতে শুরু করল দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও ছিন্নমূলের বেদনা। ষাটের দশক থেকে সমরেশ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, বিমল কর প্রমুখরা শুরু করলেন নতুন নিরীক্ষা। এই দশকেই কথাসাহিত্যের আকাশে আবির্ভূত হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রথম যে ভাষা মনে আসে সে ভাষা কবিতার, যে ছবি চোখে ভেসে ওঠে সে ছবি ‘নীরার’। কবিত্বই তাঁর হৃদয়ের প্রবল ও প্রধান সুর। গদ্যের প্রতি ছিল তাঁর চরম অনাসক্তি। তা সত্ত্বেও জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে নিতে হয়েছিল গদ্যে হাতেখড়ি। ১৯৬৬ তে শারদ সংখ্যা ‘দেশ’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’। এরই মধ্য দিয়ে হয় তাঁর জীবনের পিতৃপক্ষের সূচনা। এখান থেকেই শুরু হয় সব্যসাচী লেখকের সাহিত্য রথের জয়যাত্রা। গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য থেকে আত্মজীবনী পর্যন্ত সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই শুরু হয় তাঁর অনায়াস গতায়াত। নীরাকে নিয়ে আজীবন তিনি যে ভাঙাগড়া চালিয়ে গেলেন, নীরার যে রূপ তিনি নির্মাণ করলেন, বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় সেই কবিতাগুলো দাঁড়িয়ে রইল অতুলনীয় স্থাপত্য হিসেবে। কথাসাহিত্যেও তিনি অকপট ভাষায় বলে গেলেন সহজ সুরে নিজের মনের কথা। বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেরিয়ে এসেছিলেন তিরিশ চল্লিশের দশকের ঔপন্যাসিক পরিসর থেকে। নিজের অভিজ্ঞতাকে কোনরকম নিষেধের তোয়াক্কা না করে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন; নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন প্রকৃত সত্যকে। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’, ‘সরল সত্য’, ‘একা এবং কয়েক জন’ প্রভৃতি উপন্যাসের পথে চলেছিল তাঁর জীবন নিরীক্ষা। এপ্রিল ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম পিরিয়ড

পিস ‘সেই সময়’ প্রথম খন্ড। দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হল ১৯৮২ তে। সময়ের গন্ডি পেরিয়ে তিনি প্রথম পাড়ি দিলেন ইতিহাসের পাতায়। এরপর এল অপর পিরিয়ড পিস ‘পূর্ব-পশ্চিম’, প্রথম খন্ড প্রকাশিত হল ১ লা বৈশাখ ১৩৯৫, দ্বিতীয় খন্ড জানুয়ারি ১৯৮৯। ‘সেই সময়’, ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাস দুটির সাংস্কৃতিক প্রবাহের সুরকে তিনি একটি খাতে প্রবাহিত করে দিলেন পরবর্তী উপন্যাস ‘প্রথম আলো’ (প্রথম খন্ড জানুয়ারি ১৯৯৬, দ্বিতীয় খন্ড জুলাই ১৯৯৭) তে। ঔপন্যাসিক সুনীল তাঁর এই তিন উপন্যাসের পরিসরে বাঙালীর বিবর্তনের ইতিবৃত্তকে তুলে ধরেছেন, করেছেন সময়ের সন্ধান। ‘সেই সময়’ — ‘প্রথম আলো’ — ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাস ত্রয়ী বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের একটা বৃহত্তর ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

আমার এই গবেষণা কর্মে আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই তিন উপন্যাসকে কেন্দ্র করে যে সময় সন্ধান, সেই সময় সন্ধানের স্বরূপ খুঁজেছি। উপন্যাস ও ইতিহাসকে সমান্তরাল ভাবে সন্ধান করে খুঁজে নিতে চেয়েছি বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবর্তনের রূপরেখাকে। ঠিক কোন্ পথে বাঙালী জাতি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্য কোন্ পথে খুঁজে পেয়েছিল নিজের পরিচয়, বাঙালী নারী সমাজ ঠিক কোন্ পথে খুঁজে নিতে পেরেছিল মুক্ত আকাশ, দেশের আপামর সাধারণ মানুষ কোন্ প্রেরণার অভিঘাতে হয়েছিল রাজনীতি সচেতন, কোন্ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন হয়েছিল, দেশভাগের অভিঘাত কীভাবে বহু মানুষের জীবনকে করেছিল ছিন্নভিন্ন, কোন্ প্রেরণার অভিঘাতে শিক্ষিত যুবসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নক্সাল আন্দোলনের আগুনে, ধর্মের কারণে বিভক্ত হওয়া পাকিস্তান কোন্ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ধরে রাখতে পারেনি নিজেদের ঐক্য, আমার গবেষণার পরিসরে এই ইতিহাসের সন্ধান করেছি, ধরতে চেয়েছি বাঙালীর বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে।